আজিজা

শতরূপা বোস রায়

মাঘ মাসের সন্ধ্যেবেলায় ঘন কৃষ্ণ অন্ধকারে বটতলার পুকুরে ডুব দিয়ে ভেজা কাপড়ে তুলসী তলায় দ্বীপ জ্বেলে দাওয়ায় ওঠে নতুন বউ. এক রাশ কালো মেঘের মত চুল বেয়ে জল গড়িয়ে পরে ভিজিয়েছে তার পিঠ. সেই জল পা বেয়ে গড়িয়ে পরে, লাল মাটির দাওয়ায় টুপ টুপ করে ঝরে পরছে. অন্ধকারে এই দাওয়ার ওপরে দাঁড়িয়েই নতুন বউ শুকনো কাপড়খানা দড়ি থেকে নামিয়ে তার ভেজা বুকের ওপরে ফেলে, আলতো করে সারা শরীর ঢেকে নেয়. ভেজা চুলটাকে হাত দিয়ে গুটিয়ে মাথার ওপরে একটা খোপা মত করে. তারপর সেই স্নানের শাড়ি টাকে যত্ন করে দড়িতে টানটান করে মেলে ঘরে এসে শ্যামসুন্দর এর মূর্তির সামনে একটি ছোট্ট মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে, এলো চুলে আয়নার সামনে গিয়ে বসে.

এই সময়টা বাড়িটা যেন একটা স্তব্ধতা মাখা নিঃসঙ্গতায় খাঁ খাঁ করে. দিনের আলোয় তবু যেন তার একাকিত্ব এক অচীন উষ্ণতার পরশে ঢাকা থাকে. কিন্তু এই সন্ধ্যা ও রাত্রির অন্ধকারের ছায়ার অন্তরালে যেন এক বিষাদ ঘনিয়ে থাকে. সেই বিষন্ন আলো আধারীকে গায়ে মেখে নতুন বউ নিজের দিকে তাকিয়ে থাকে অপলক দৃষ্টিতে.

হিমেল হাওয়ায় ভেসে আসে পাশের গোঁসাই বাড়ির সন্ধ্যা আরতির কাঁসরের শব্দ. বুক ভরা বেদনায় নতুন বউ আবার উঠে দাঁড়ায়. শাড়িটাকে এবারে সে আরেকটু আটসাট করে পরে. চুলের খোঁপা খুলে, ভেজা চুল এলিয়ে, তুলসী তলায় এসে দাঁড়ায়. শাখ বজায়, ধূপ জ্বালায়, তারপর আবার নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে প্রদীপ নিভিয়ে অন্ধকারে মিশে যায়. রাত্রি দ্বিপ্রহরে সদর দরজায় কড়া নড়ে ওঠে. কিন্তু নতুন বউ তবুও বেরয় না ঘর থেকে. একবার, দুবার, এরপর ঘন ঘন কড়া নাড়ার শব্দ. শীতের রাত্রে, লেপের উষ্ণতার মধ্যে নিদ্রাতুর প্রতিবেশীরাও কড়া নাড়ার শব্দে জেগে ওঠে. প্রতিবেশীর বিপদে ঝাপিয়ে পরবার জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ তারা. ঔৎসুক্য বাগ মানে না এবারে. কিন্তু নতুন বউ তার সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে উদাসীন. প্রায় আধ ঘন্টা পরেও যখন রাত্রের এই অতিথিকে বাড়িতে আপ্যায়ন করে না কেউ, তখন সেই অতিথি তীব্র স্বরে শুরু করে ভৎর্সনা...

"ভারী তো সতীপনা... খুব তো সতী সাজ্ছিস... দেখব এত সতীপনা তোর কোথায় থাকে ... এ গাঁয়ে থাকা বন্ধ করে দেব তোর মাগী..."

নতুন বউ এর নাম কেউ জানে না এই গ্রামে. রূপনারায়ন এর পাশে আম, জাম, কাঠালের ছায়ায় ঘেরা ছোট্ট একটু গ্রাম. শীতের রুক্ষতা ভরা হওয়ার মধ্যেও কেমন যেন মমতা মাখা. এ গাঁয়ের সবাই তেমন মায়া মমতায় একে অপরের সুখে দুখে এক সঙ্গে একটি মাত্র ঘর বেঁধেছে. তাদের মনগুলোও তাই ছায়া নিবির ভালবাসার বিনি সুতোর মালে গাঁথা. আজ প্রায় ৫ বছর হলো নতুন বউ এই গাঁয়ে এসে বসবাস করছে. তার রূপের কথা রূপনারায়নের ঘাটে ঘাটে ফেরে. দোহারা চেহারা, শরীরের গঠন যেন চাবুকের মত. দুধে আলতা গায়ের রং. ঠোট দুখানি যেন তুলি দিয়ে আঁকা. পায়ে নুপুরের রিনি রিনি শব্দ তুলে এক গলা ঘোমটা দিয়ে এলো চুলে ভেজা কাপড়ে বটতলার শিব মন্দিরে জল ঢালতে যেত যখন নতুন বউ, সবাই যেন সেই সৌন্দর্যে মোহিত হত. বটতলার ব্রাহ্মণ কর্তারাও সব শাস্ত্র ভুলে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত ওর দিকে. কিন্তু কেউ কোনদিন সাহস করে প্রশ্ন করত না নতুন বউকে. সে কোনো এক বাড়ির বউ. আর ওই গাঁয়ে নতুন তাই খুব স্বাভাবিক ভাবে সকলে তাকে নতুন বউ বলে সম্বোধন করতে শুরু করে. কিন্তু বাড়ির বউ এর আড়ালে তার যে আসল সত্তা, সেটি সম্পর্ণ ঢাকা পরে যায় তার অবগুন্ঠনআবৃত নতুন বউ এর পরিচয়ের অন্তরালে. হিত এমটি সেই চেয়েছিল. তাই সহজেই নতুন বউ এর পরিচয়ে কাটিয়েছে সে জীবনের কয়েকটি বছর এই গাঁয়ে.

তার ঘরখানি ছোট্ট. মাটির দাওয়া. টালির ছাদ, পাতার ছাওনি. ঘরের সামনে একটু খানি উঠোন. অপরদিকে ছোট্ট একটুখানি রান্নাঘর. তারপরের ঘরটি তালা বন্ধ. নতুন বউ এ বাড়িতে এসে অবধি ওই ঘরটি তালা বন্ধই দেখেছে. উঠোন পেরিয়ে

অন্যদিকে গোয়াল ঘর. হয়ত গরুও ছিল কোনকালে. কিন্তু সে গোয়ালঘর এখন শুন্য. নতুন বউ সেখানে কিছু খর, শুকনো কাঠ আর একটা ভাঙ্গা তক্তপোষ রেখেছে. গোয়াল ঘরের পাশেই সদর দরজা. সচরাচর এই দিকটায় কেউ আসে না. সন্ধ্যাবেলায় ঘাটে যাবার সময় সেই যে খিল পরে, আবার পরের দিন ঘাটে যাবার সময় সেই খিল নামানো হয়. এ গাঁয়ের কেউ কোনদিন নতুন বউ এর ঘর দেখেনি. তার স্বামীকেও দেখেনি. কোনো ছেলেপুলেও নেই নতুন বউ এর. তাই তো রাত্রি নিঝুম অন্ধকারে দরজায় কড়া নড়ে ওঠে. কে যেন আসে নতুন বউ এর কাছে.. তার সঙ্গে দেখা করতে. কিন্তু সে দরজা খোলে না. দেখাও করে না. সাহসে বুক বেঁধে পরে থাকে একা... বিছানার ওপরে চাদর আঁকড়ে. চোখ দিয়ে অঝোরে জল পরে. অন্ধকারে হাতরে মরে একটু নিরাপত্তা. একদিন দুপুরে যখন সে সবে উনুনে জল ঢেলে দাওয়ার এক ধারে এক মুঠো ভাত আর কি একটা তরকারী নিয়ে বসেছে, সদর দরজায় ঠিক সেই সময় কড়া নড়ে উঠেছিল. গলা উচিয়ে সন্ত্রস্ত নতুন বউ হাঁক পারে কে? নিজের গলার স্বর আজ সে বহুদিন পরে শুনলো. আজ কাল তো নিজের ছায়াটুকু ছাড়া আর কোনো সঙ্গী নেই তার তাই নিজের গলাটাও তার কাছে অপরিচিত এখন. বাইরে থেকে এক মহিলা কন্ঠস্বর ভেসে আসে. "নতুন বউ দোর খোল. আমি পাশের বাড়ির গোঁসাই গিন্নি." ভাতের থালায় ঝুরি চাপা দিয়ে ঘরা থেকে জল নিয়ে হাথ ধুয়ে পিরি পেতে আপ্যায়ন করে নতুন বউ তার প্রথম অতিথিকে.

"তোমার কথা ঘাটে গিয়ে অনেক শুনেছি. তাই আলাপ করতে এলুম... তুমি এ বাড়িতে এসে অবদী তোমার সঙ্গে আলাপ করা হয় নি... আহা... এ বাড়ির ভট্টাচার্য গিন্নি মরার পরে বাড়িটাই খাঁ খাঁ করে এখন. তুমি একা .. একেবারে নিরুন্ধু একা কি করে থাক? তোমার কত্তাটি কোথায় থাকে?

নতুন বউ এ প্রশ্নের যে সম্মুখীন হবে একদিন তা মনে মনে জানত. সমাজে বাস করে, সমাজ থেকেই যে মুখ ফিরিয়ে থাকা যায় না, তা বোধ হয় সে ছাড়া আর কেউ ভালো জানে না. খানিক ইতস্তত করে নতুন বউ বলে ওঠে, "আপনি প্রথম দিন এলেন, আপনাকে যে কি দিয়ে জল দি? বাড়িতে এ অসময়ে কিচ্ছুই নেই.."

গোঁসাই গিন্নি প্রশ্নের উত্তর না পাওয়ায় একটু বিরক্তির সুরে বলে ওঠে, " আমি এই শীতের অবেলায় কিছু খাব না. আর তাছাড়া আমি যেখানে সেখানে খাই না. বাড়িতে বিগ্রহ আছে. গিয়ে আবার পুজোর আয়োজন করতে হবে."

নতুন বউ এবারে ঘোমটার আড়াল থেকে চোখ তুলে তাকায়. "ও আপনার বাড়িতেই বুঝি পুজো হয় রোজ? আমি আরতির শব্দ শুনতে পাই."

কথা অন্যদিকে বয়ে চলেছে দেখে গোঁসাই গিন্নি সেই সুরেই সুর মিলিয়ে বললেন, "এস না একদিন সন্ধ্যাবেলা? পুজো দেখবে?"

কথার বাঁধন ধরে রাখার মত ক্ষমতা, জ্ঞান. বুদ্ধি, কিছুই নেই গোঁসাই গিন্নির. প্যাচ কষাও স্বভাব নয় তার. ওই মাঝে মধ্যে ঘাটে বসে একটু পর নিন্দা পর চর্চা. রাত্রে পানের বাটা নিয়ে বসে স্বামীর সঙ্গে একটু এ পারার খবর ও পারার খবর... ওই টুকুতেই সীমাবদ্ধ ... কপালে রক্তচন্দন, মাথার সিথিতে লাল টকটকে সিঁদুর, লাল পার সাদা শাড়ী, কাঁচা পাকা চুল, এ গাঁয়ের গোঁসাই গিন্নি যেন সাক্ষাত জগৎজননি. মনটাও তার তেমনি মাটির মতই নরম.

মুখে পানের খিলি পুরে, গায়ের চাদরটি দিয়ে আলতা মাখা পাদুটো ঢেকে গোঁসাই গিন্নি সব কৌতুহলকে দুরে ঠেলে দিয়ে সহজ সুরে এবারে বলে ওঠেন, "আজি এসো না তাহলে সন্ধ্যেবেলা? এ গাঁয়ের অনেকেই পুজো দেখতে আসে. তোমার ওই বুড়ি ও যেত রোজ আমাদের বাড়ি... তখন তুমি এই বাড়িতে আসো নি. তুমি আসার পর থেকেই তো তোমার ওই বুড়ি অসুস্থ্য. শুনেছি তোমার সেবার কথা. খুব করেছিলে ... কিন্তু শেষ রক্ষা তো আর করা গেল না? "

নতুন বউ গলার আওয়াজ নিচু করে মাথার ঘোমটা আরেকটু টেনে নিয়ে বলে.. "হ্যা আমি কি আর মৃত্যকে আটকে রাখতে পারতাম? সে তো যখন তার নিজের নিয়ম এ আসার আসবেই.. তবে আমার যতটুকু করার আমি করেছি. আর আপনি মন্দিরে গিয়ে পুজো দেখার কথা বলছেন? সে আমার আর হবে না... আমি রাত্রে বিশেষ বেরই না.. অন্য কোনো সময় যাব?"

তোমার কে হয় গা ওই ভট্টাচার্য বুড়ি? অর তো কোনো ছেলে ছিল বলে জানা নেই? তাহলে? কোনো আত্তীয় বুঝি?"

নতুন বউ সে কথার উত্তর দেয় না. মাটি থেকে উঠে দাড়িয়ে অল্প হেসে বলে... "মাঝে মাঝে ওই বুড়ি কেই বড় দেখতে ইচ্ছে করে... "

"তোমার কত্তা? সে এলে তবু তোমার তোমার একাকিত্ব একটু কাটে. সে আসে না বুঝি?"

নতুন বউ এবারে হেটে এসে দরজার সামনে দাড়ায়. সেই দেখে গোঁসাই গিন্নিও বোঝেন যে সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া হয়ত অত সহজ নয়. তাই একটু মনক্ষুন্ন হয়েই বলেন "না: এবারে আমি উঠি...তাহলে এসো সন্ধ্যেবেলা? পুজো আমাদের সন্ধ্যে ৭ টার মধ্যেই শেষ হয়ে যায়.আমি না হয় কাউকে পাঠিয়ে দেব?"

"আমায় আর বলবেন না যেতে. বার বার বললে আমার লজ্জা করবে. আপনার বাড়ি পুজো দেখতে আমার আর যাওয়া হবে না".

একটু হলেও অপমানিত বোধ হয়েছিল সেদিন গোঁসাই গিন্নির. একে তো রাধাশ্যাম মন্দিরের পুজো তার পর আবার গোস্বামী বাড়ি. থম থমে মুখ নিয়ে সেদিন গোঁসাই গিন্নি ফিরে এসেছিলেন বাড়িতে. অল্প হলেও রাগ ও করেছিলেন মনে মনে. তবুও একদম ফেলতে পারেননি নতুন বউ কে. তার গাম্ভীর্য, মার্জিত ব্যবহার, তার সংস্কার, কোথায় যেন একটা কিচ্ছু রহস্যে ঘেরা সে. এমন মেয়ে কে এই গ্রামের গৃহ বধু রূপে কল্পনা করতে কোথায় যেন বাঁধে. যে সমস্ত গুজব, কটুকথা নতুন বউ এর নামের সঙ্গে জুড়েছে সে কথা গুলো এখন কেমন যেন মিথ্যে বলে মনে হয় গোঁসাই গিন্নির. অথচ নতুন বউ এর আসল পরিচয় জানার জন্য ছটফট করতে থাকেন তিনি মনে মনে.

ভট্টাচার্য গিন্নি বিধবা বুড়ি... বহুকাল এই বাড়িতে বসবাস করেছে সে. গোঁসাই গিন্নি বিয়ে হয়ে থেকেই এই ভট্টাচার্য গিন্নিকে দেখেছে. সে নিস্সন্তান, একাই থাকত এই বাড়িতে. হঠাত একদিন এই বউ এর আবির্ভাব. এত কথা মনে মনে ভাবতে ভাবতে গোঁসাই গিন্নি পুজোর আয়োজন শুরু করলেন. নতুন বউ এর সৌন্দর্য যেমন তাকে আকৃষ্ট করেছিল সেদিন ঠিক তেমনি করে নতুন বউ ও যেন তাকে মুগ্ধ করেছিল তার কথা বলার ধরনে, তার চলার ভঙ্গিতে, তার চোখের ভাষায়. অমন সবুজ চোখের রং গোঁসাই গিন্নি কখনো দেখেননি. তাই এত রহস্যময়তার পরেও কোথায় যেন একটা ভালোলাগা জন্মেছিল নতুন বউ এর প্রতি.

পরের দিন দুপুর বেলা, অলস শীতের রোদের হালকা আঁচে উঠোনে বসে নতুন বউ একটা বই হাতে অন্যমনস্ক ভাবে শুয়ে ছিল পাটির ওপরে, গোঁসাই গিন্নি আবার এসে কড়া নাড়লেন.

"কাল তো তুমি এলে না তাই তোমার জন্য একটু প্রসাদ নিয়ে এলাম." নতুন বউ প্রসাদের বাটি হাতে নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে শান্ত কন্ঠে বলে ওঠে, "প্রসাদ? আমার কি ভাগ্য আজ! আমার শ্যামসুন্দর তো জল বাতাসা ছাড়া আর কিছু দিতে পারি না..."

বলতে বলতে গলা ধারে এলো নতুন বউ এর... চোখে জল ভরে এলো.. আঁচলের খুট দিয়ে জল মুছে সে ধীর পায়ে উঠে ঘরে গিয়ে শ্যামসুন্দরের সামনে বাটিটা রেখে, মুচকি হেসে বলল, "এই নাও তোমার প্রসাদ... তুমি ইই খাও আবার.."

দাওয়ায় গোঁসাই গিন্নি মনে মনে ঠিক করে এসেছেন.. সব প্রশ্নের উত্তর না নিয়ে তিনি আজ যাবেন না. তাই কালী দাসী কে বলে এসেছেন পুজোর জোগার করতে. পানের বাটা খুলে, রোদ এ চুল এলিয়ে বসে তিনি নতুন বউ এর অপেক্ষায় রইলেন... কখন সে নিবেদন করে বেড়োবে আর তিনি প্রশ্নের ঝুলি খুলে বসবেন. উত্তর গুলো জোগার করে পরের দিন ঘাটে গিয়ে জয়জয়কার তো তারই হবে... এই গ্রামের সব চেয়ে বড় রহস্য উদঘাটন করার কৃতিত্ব কেউ কি ছাড়ে?

দাওয়ায় ফিরে এসে নতুন বউ গোঁসাই গিন্নি কে বলে, "শুনেছি একবার নিবেদন করা প্রসাদ আবার ঠাকুরকে দেওয়া যায় না. কিন্তু আমি তা মানি না... এত ভালো প্রসাদ আমি খাব আর আমার ঠাকুর খাবেন না?"

গোঁসাই গিন্নি এবারে আর চুপ করে থাকতে পারলেন না... সব ভুলে প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে জিগ্গেস করলেন," তুমি এই গাঁয়ে এলে কি করে গা? তোমার স্বামী নিয়ে এয়েচেন বুঝি? তোমার স্বামী কি করেন? এখানে থাকেন না বুঝি?"

বুকের মধ্যে যেন শেল বিদ্ধ হলো. পায়ের আঙ্গুলগুলো একসঙ্গে করে মাটি আঁকড়ে ধারে নতুন বউ ধরা গলায় মাথা হেট করে বলল, "প্রতি রাত্রে যিনি এসে কড়া নাড়েন এ বাড়িতে, যাকে মাই দরজা খুলে দি না.. যার চিৎকারে আপনাদের রোজ রাত্রে ঘুম ভাঙ্গে, তিনি ইই আমার স্বামী..." এই বলে নতুন বউ প্রসাদ সুদ্ধ বাটিটা গোঁসাই গিন্নির সামনে এনে রেখে দেয়. তারপর পাটির ওপরে বাবু হয়ে বসে বলে ওঠে, "আপনি তো প্রশ্নের উত্তর নেবার জন্য এসেছিলেন... প্রসাদ দিতে আসেন নি... তাই না?"

গোঁসাই গিন্নি এবারে কেমন যেন কথার খেই হারিয়ে ফেললেন. গা ময় এই কথাই রাষ্ট্র হয়েছে. নতুন বউ এর বর মাতাল.. লম্পট... কেউ এও বলেছিল সে নাকি বিধবা.. স্বধবার বেশ ধারে থাকে.. কিন্তু আজ সত্যি তা নতুন বউ এর কাছ থেকে জানার পরে তিনি কি বলবেন বুঝে পেলেন না.. চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ...

ইতিমধ্যে পাটির ওপরে রাখা বইটা তার চোখে পরেছিল. তিনি সেই বইটা হাতে নিয়ে বললেন... "এমন বই তুমি কোথায় পেলে? এ গাঁয়ে তো কেউ ইংরিজি বই পড়ে না?"

নতুন বউ এবারে গোঁসাই গিন্নির দিকে তাকিয়ে চরম দৃঢ়তার সঙ্গে বলে ওঠে... "আমার সম্পর্কে জানার কৌতুহলটা চেপে রাখা খুব কঠিন তাই না? গল্পের এত উপাদান... রসদ.. কিচ্ছুই তো কাল সংগ্রহ করা হয়নি.. তাই বুঝি আবার ছুটে এসেছেন...? "

গোঁসাই গিন্নি এবারে লজ্জার সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেলেন. এরকম ত্যাজ তিনি কোনো মেয়েমানুষের মধ্যে দেখেননি. ইতস্তত সুরে তাই বললেন, "তুমি আমায় ভুল বুঝো না... আমি বরং আজ যাই? তোমার কাছে না হয় অন্য আরেকদিন আসব. লোকে জিগ্গেস করে .. আমার পাশের বাড়িতে থাক.. আমি কিছু জানি কি না.. তাই জিগ্গেস করেছিলাম.. লোকের কথা তো তুমি যেন? কত লোক এ কত কথাই বলে... তুমি আমায় ভুল বুঝো না... আর এই প্রসাদ টুকু রেখে গেলাম.. প্রসাদ এর ওপরে রাগ কর না... আমি আবার পড়ে আসব কেমন?"

সেদিন দরজায় খিল দেয়ার পড়ে নতুন বউ আর বেরোলো না. ঘাটেও গেল না. ঘড়ি ধরে আরতিও শুরু হলো গোঁসাই বাড়িতে. শাঁখ বাজলো... কাঁসর বাজলো... কিন্তু নতুন বউ ঘরের দোর খুলল না. ঘরে প্রদীপ জ্বললো না... তুলসী মঞ্চে বাসী ধুপের কাঠি আর ছাই পরে রইলো.. রান্না ঘরে বাসন পরে রইলো... উনুনে কাঠ উঠলো না...

বিছানার ওপরে উপুর হয়ে বসে শুধু প্রমাদ গুনলো সে. রাত্রি দ্বিপ্রহর এ কখন আবার কড়া নড়ে উঠবে. সে মনে মনে স্থির করেছে আজ সে দরজা খুলে আপ্যায়ন করবে তার অতিথিকে. তার স্বামীকে. মাতাল.. মানসিক ভাবে বিকৃত এই লোকটি কে একবার ডেকে জিগ্গেস করবে কেন তার এই নির্বাসন? কার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে সে? ওই ভট্টাচার্য গিন্নি যে তার কেউ হয় না... ভাবতে ভাবতে তার চোখের জল এ বিছানা ভিজলো... ভাবতেও তার বুকের ভেতর কেপে উঠলো.. কি করে সে প্রতি নিয়ত একটি ছায়ার সঙ্গে বসবাস করে... স্বামী সে তো নামেই... অন্য জায়গায় অন্য ঘর আছে তার.. তার সঙ্গে কখনো মনের মিল হয় নি... মন্ত্র পরে বিয়েও হয়নি ... সে ইতিহাসের কথা মনেও আনতে চায় না সে... অথচ মনে তাকে আনতে হবেই... এই অন্ধকারএ একা আর যে সে পারছে না ... এই বার হয়ত সবটাই উদঘাটিত হবে... আর যেদিন সবাই সব জানতে পারবে সেদিন রেহাই নেই... রেহাই নেই... ব্রাহ্মণের ঘরণী সেজে সে পাপ করেছে কিনা জানে না... কিন্তু লোককে ঠকিয়েছে সে... ভট্টাচার্য গিন্নির শ্যামসুন্দর কে ঠকিয়েছে সে... আজ যদি নতুন বউ এর আড়ালে তার আসল নাম সবাই জানত?

তাহলে কবে রূপ নারায়ন এর ধারে তার মৃত দেহ পরে থাকত...ভাবতে ভাবতে তার বুকের মধ্যে সব কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যায়. সেদিন সেই রাত্রে এই ভট্টাচার্য গিন্নির কাছে আশ্রয় চেয়েছিল সে... সেদিন যখন কলকাতা থেকে প্রানের ভয়ে পালিয়েছিল সে... গ্রামের নাম জানা ছিল না.. নৌকা করে এই রূপ নারায়নের ঘাটে এসে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল তার স্বামী ... হয়ত সেই লোকটা...যাকে সে স্বামী বলে পরিচয় দিয়েছে সবার কাছে.. সেদিন সেই ঝড়ের রাতে...সেই ভট্টাচার্য বুড়ি লুকিয়ে ঘরে তুলেছিল তাকে.. হয়ত এ বিধাতারই কোনো খেলা না হলে অচেনা ওই মানুষটিকে তার সেবা দিয়ে.. ভালবাসা দিয়ে কেনই বা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করবে নতুন বউ? সেই থেকে এই বাড়িতে তার ঠাই হয়েছে... তার..

রাত্রি ঘনিয়ে আসে. নিশি ডেকে ওঠে. এক ঝাঁক জোনাকি হঠাত ঘরের মধ্যে আলোর মালা জ্বালিয়ে দিয়ে বাইরে ঝি ঝি পোকার ডাকের সঙ্গে মিলিয়ে গেল আবার. শুক্লপক্ষের চাঁদ সমস্ত গাঁয়ের চোখে রেখে গেল ভালবাসার পরশ. মায়াবিনী নিশীথিনী রহস্যের জাল বুনে চলল নিজের হাতে. নতুন বউ দু চোখের পাতা এক করতে পারল না সারারাত. প্রমাদ গুনলো চৌকির ওপরে শুয়ে. কখন আসে ডাক? কখন দরজায় এসে দাঁড়ায় অতিথি.

কিন্তু রাত্রি শেষে একটু একটু ভোরের আলো ফুটল. জোনাকির সেই দলও গেল হারিয়ে আলোয়. রূপ নারায়নের তীরে মাঝিরা এসে ভিড় করলো একে একে. নৌকা নিয়ে এবার পারি দিতে হবে মাঝ দরিয়ায়. গোঁসাই বাড়ির গোয়ালঘরে গরুগুলো সোরগোল জুড়ল. বাল্যভোগের আয়োজনে রান্নাঘরেও শুরু হইচই. নতুন বউ আচ্ছন্ন হয়ে পরেছিল সারারাত. হঠাত ভোরের প্রথম রোদের ছোঁয়ায় বিছানার ওপরে উঠে বসলো সে. সদর দরজায় কে যেন এসে ডেকে উঠলো আজিজা.... !! শিউরে উঠলো সে... এখানে আজিজা নামে তো কেউ তাকে চেনে না? তাহলে কি কলকাতা থেকে সেই সমন এলো এত দিনে? তাহলে তো এবারে দেশে ফেরার পালা...

নতুন বউ খাটের পাশে পরনের কাপড় খানি ছেড়ে আলনা থেকে কাচা কাপড় পরে বেড়িয়ে আসে ধীর পায়ে...

"আপনি কি আজিজা? আমরা কলকাতা থেকে আসছি.. এবার যে যেতে হবে আপনাকে... আপনি আসুন আমরা গাড়ি তে আছি ..." কিছু বন্দুক ধারী পুলিস আর একটা ভ্যান বাড়ির বাইরে তার জন্য অপেক্ষা করে রইলো.. নতুন বউ শ্যামসুন্দরের আসন থেকে মূর্তি তুলে নিয়ে পুলিসের থেকে অল্প সময় চেয়ে নিয়ে ঢুকলো গোঁসাই বাড়িতে.

সেদিন সেই পুলিসের ভ্যান এর মধ্যে নতুন বউ এর চেহারা কেউ দেখেনি. এক ঝাক ছেলে পিলে সেই ভ্যান এর পেছন পেছন অনেক দূর অবদি ছুটে ছুটে এসে তারপর ক্লান্ত হয়ে গাঁয়ের পথ ভুলে যাবার ভয়ে আবার ফিরে যায়. বটতলায় সবাই জোর হয়ে একে অপরের মুখ মুখ চাওয়া চাওয়ি করে. কারুর মুখে কোনো কথা সরে না. তাহলে কি নতুন বউ কোনো জাদরেল খুনি আসামী? খুন করে এই গাঁয়ে গা ঢাকা দিয়ে ছিল এত দিন? না কি অন্য কিচ্ছু রহস্য? সেদিন সকালে কারুর উনুনে কাঠ উঠলো না. গোয়ালঘর নিকোনো হলো না. ঝড়া পাতায় ঢাকা বাসী উঠোন পরে রইলো যেমন তেমন... ঘাটে ভিড় হলো না... সবাই বটতলায় নিথর হয়ে বসে রইলো.. একজন শেষে হঠাত বলে উঠলো এ গাঁয়ের একটা শান্তি সস্তয়ন করা দরকার... যা বিপদ গেল?

সময়ের হাথ ধরে দিনের আলো ঢলে পড়ল পশ্চিম দিকের ঘন মেঘের কোলে. এই শীতের বিকেলে এমন ঘনঘটা ... এমন ঝোড়ো হওয়া... গাঁয়ের লোক বলল যাক বাবা বৃষ্টিতেই সব পাপ ধুয়ে যাবে...

গোঁসাই বাড়িতে সেই বৃষ্টি ভেজা সন্ধ্যেবেলায় নিজের নিয়মে শুরু হলো নিত্য পুজো. কালী দাসী সব ভার নিয়ে একাই সামলালো আজ পুজোর কাজ.

গোঁসাই গিন্নি বৃষ্টি মাথায় নিয়ে অন্ধকারে এসে দাড়ালেন ভট্টাচার্য বুড়ির দাওয়ায়, তুলসী তলায়. নতুন বউ তাকে যে তার সব কথা বলে গেছে আজ... কিন্তু কি অদ্ভূত আজ কিন্তু সব কিচ্ছু জানার পরে চরম ভালবাসায়, মমতায়... গোঁসাই গিন্নির গলা ধরা এসেছে... ঘাটে যেতেও ইচ্ছে করে নি.. এই গাঁয়ের রহস্যময়ী নতুন বউ এর কথা কাউকে বলতে ইচ্ছে করে নি... শুধু নতুন বউ কে দেখতে ইচ্ছে করেছে আরেকবার... তার সব কথা জানার পরে তার সঙ্গে গল্প করতে ইচ্ছে করেছে আবার নতুন করে... সেই শীতের দুপুরে পাটির ওপরে পানের বাটা নিয়ে.. তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করেছে.. তার সাহস..তার চিন্তা ধারা, তার ধৈর্য্য, তার মানুষিক শক্তি, জীবনের জন্য লড়াই.. সব কিচ্ছু মিলিয়ে নতুন বউ এর সেই গভীর সবুজ চোখের মধ্যে প্রবেশ করতে ইচ্ছে হয়েছে. কিন্তু তবুও কি ছারখার হওয়া রক্তাত্ত বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হাজার কষ্টের খোঁজ মিলত? কি করে সে এমন সাহস পেল? মেয়েমানুষ! সে তো সমাজের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য জন্মায় না? তাহলে মেয়েমানুষ হয়ে এমন শক্তি সে পেল কি করে? এত দুখও বা সে নিজের মধ্যে নিয়ে বহন করে বেড়াত কি করে?

বাড়িটা আজ যেন সত্যি খাঁ খাঁ করছে... ঘরের মধ্যে নতুন বৌএর ছাড়া কাপড়টা পরে আছে ঠিক সেই ভাবে... তুলসী মঞ্চটা ঝড়ের হাওয়ায় উপরে পরে আছে... যেন গভীর বেদনায় মুষড়ে পরেছে এই গাছটিও... মাদুর টি হাওয়ায় উড়তে উড়তে উঠোনের ধুলোর মধ্যে পরে রয়েছে.. বৃষ্টিতে ভিজে গেছে... দড়িতে শুকনো কাপড়ও উড়ে গিয়ে চালের ওপরে পরে রয়েছে.. অনাদরে... সব কেমন যেন এক মুহুর্তের মধ্যে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল... গোঁসাই গিন্নি নতুন বৌএর কাপড় খানা চাল থেকে নামিয়ে... সেই বৃষ্টি মাথায় করেই ঘরে এসে ঢুকলেন ... খাটের পাশে সেই ইংরিজি বইটা আর আরও একটা কালো কাপড়ে মোরা বই.. গোঁসাই গিন্নি দুটো বই হাতে তুলে নিয়ে একবার মাথায় ঠেকিয়ে তারপর নিজের আঁচলএর মধ্যে লুকিয়ে বাড়ির বাইরে এসে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন... বৃষ্টির সঙ্গে তার চোখের জল একাকার হয়ে গেল... তারপরে বেশ কয়েকদিন ঘাটে গেলেন না গোঁসাই গিন্নি. বাড়ির বাইরেও বেরোলেন না বেশি. আর একদিন দুপুরবেলা যখন সবাই ঘুমিয়ে রইলো তখন ঘাটে যাওয়ার পথে কিচ্ছু আগাছার মধ্যে সেই বই দুখানি জ্বালিয়ে দিলেন... আর মনে মনে বললেন... তোমার আল্লা যেন তোমায় রক্ষ্যা করে নতুন বউ.. তোমার দেশে ফিরে যাও তুমি... যা শাস্তি হবার সেখানেই হোক তোমার... মৃত্যুর মধ্যেই তুমি মুক্তি পাও... ভালো থেকো নতুন বউ...!

2nd part

১৯৮৯. জানুয়ারী, আফগানিস্থান

কাবুল শহরের পশ্চিম প্রান্তে ছোট্ট একটি বসতি. ৫০ টি ঘর মিলে এই বসতি গড়ে উঠেছিল শহরের একটু নিচু তলার মানুষের ভীরে. এখানে কেউ বা ছুতোর মিস্ত্রী, কেউ বা মুচি, আবার কেউ কলের কাজ করে, কেউ মাটির. অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবধানের ফলে এই হত দরিদ্র মানুষগুলি সমাজের বঞ্চনার স্বীকার. এরা নিপীড়িত, লাঞ্চিত, এদের কথা শোনার কেউ নেই. এদের কান্নার কোনো শব্দ নেই. এদের দুখের কোনো মূল্য নেই. কিন্তু তবুও এরা হাসে. নিজেদের ছোট্ট কোলবা বা বসতির মধ্যে এরা জীবনের জয়গানে তাই মুখর.

এমনি একটি ছোট্ট কোলবাএ থাকে রশিদ আর আজিজা. ওদের দুই সন্তান নূর আর তারিখ. তৃতীয়টি তখনও আজিজার গর্ভে. সোভিয়েত রাশিয়া তখন সবেমাত্র আফগানিস্থান ছেড়ে নিজের দেশে ফিরে যাচ্ছে. পাহাড়ে ঘেরা সাদা বরফে ঢাকা খোলা প্রান্তর. সেই খানে নূরকে কোলে নিয়ে রশিদ রোজ বিকেলে সোভিয়েতদের কামানের সারি দেখতে যেত. দূর থেকে সারিবদ্ধ ভাবে বন্দুক হাতে দেখা যেত সেনাবাহিনীকে পাহাড়ের ওপরে সীমানা সুরক্ষা করছে. রক্তাক্ত ইতিহাসের হয়ত তখনও কিছু বাকি আছে. রশিদ বাড়ি ফিরে আসে. চৌপাটিতে চা নিয়ে বসে আসন্ন জীবনের হিসাব নিকাশ করে. হয়ত এবারে কাবুল ছাড়ার সময় হয়েছে. হয়ত পারি দিতে হবে অন্য কথাও? অন্য কোনো খানে... সেই অজানা মহাদেশে ... আমেরিকা না কি নাম? সবাই তো সেই উদ্দেসেই চলেছে. কোলবার অনেকেই পাকিস্তান পালিয়েছে তারপর সেখান থেকে আমেরিকা... কিন্তু আজিজা রাজি হয় না... তার জন্ম সেই কোলবাএ. এখানেই সে বড় হয়েছে. তখনও তার আফগানিস্থানএর গায়ে যে এমন রক্তের দাগ লাগে নি. এখানেই সে পড়াশুনা শিখেছে. আব্বাজান এর হাত ধরে স্কুলএ গেছে রোজ.. বিকেলে রশিদ এর সঙ্গে চুপি চুপি দেখা করে প্রেম করেছে দুজনে. গাছের তলায় শুয়ে থেকে একদৃষ্টে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকেছে... মেঘের কাছে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছে... তারপর ঘরও বেঁধেছে তারা... সুখের ঘর...তাই এই দেশ ছেড়ে যাবার কথা মনে আসলেই তার চোখ জলে ভরে ওঠে. বুক কেঁপে ওঠে.

সেদিন সকালে, প্রতিদিনের মতই বরফে ঢাকা রাস্তা দিয়ে রশিদ চলে যায় শহরে কাজের খোঁজে. শীতের সময়টা তার তেমন একটা রোজগার হয়না. তাই বিকেলের আগেই কোনকোন দিন সে ঘরে ফিরে আসে. আজিজা সকালে রোদ উঠলে লেপ, বিছানা গরম করতে দেয়. নূর আর তারিখকে স্কুলে পাঠায়. তারপর তন্দুর এ যাবার জন্য এক রাশ ময়দা নিয়ে শরীরের সব শক্তি প্রয়োগ করে ময়দা ঠেসে তাতে দই মাখিয়ে ভিজে কাপড়ে ঢেকে গোসল করতে যায়. ভেজা চুলের ওপরেই কালো রঙের বোরখা পরে, মাথা ঢেকে নেয়. চোখে সুরমা লাগায়. তারপর গর্ভস্থ সন্তানটিকে নিয়ে ধীর পায়ে যায় তন্দুরে. দিনের শুরু হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই কারফিউ শুরু হয়ে যায়. আফগানিস্থান এখন তালিবানের অধীনে. রাশিয়ানরা চলে যাবার পরে এই তালিবানই দেশ টাকে শাসন করতে তাদের নতুন দল তৈরী করেছে. শহরের মধ্যে কারফিউ চলে শুধু মাত্র বিকেলের পরে.. কিন্তু এই গ্রামের দিকে ... কোলবার অঞ্চল গুলোতে সকালের পর থেকেই নিস্তব্ধ হয়ে যায় রাস্তা ঘাট. আজিজা পা চালিয়ে তারাতারি পৌছয় তন্দুরএ. সকালে এই সময়টায় লায়লা, নানু, ফাতিমা এরাও আসে তন্দুরে.একটা কাঠের ঘরের মধ্যে বিশাল একটি উনুন. এই কোলবাএ এই একটি মাত্র তন্দুর তাই শীতের সকালে উনুন পারে এই আড্ডা দারুণ জমে ওঠে. বাড়ি থেকে বয়ে আনা ময়দা বের করে আজিজা ছোট ছোট গলা করে তারপর দুই হাতের মধ্যে চেপে চেপে সেই ছোট গোলাটিকে রুটির মত করে তন্দুরের গায়ে লাগিয়ে দেয়. একজন একসঙ্গে ৫ টার বেশি রুটি করতে পারে না. তারপর সেই রুটি গরম কাপড়ে মুড়ে বেতের ঝুরির মধ্যে নিয়ে আজিজা বাড়ি ফেরে. রাস্তায় বন্দুকধারী সেনা বাহিনী তাদের ওপরে নজর রাখে. কোনো মেয়েমানুষ একা এই সময় রাস্তায় বেরোয় না. কোথাও যেতে হলে একসঙ্গে ৮ কি ৯ জন যায়. আর একা মেয়েমানুষ গেলে সঙ্গে পুরুষমানুষের থাকাটা দরকার. আজিজা ভয়ে ভয়ে বাড়ি ফেরে. সব সময় তার মনে হয় মৃত্যু যেন শিয়রে. যা সমস্ত খবর আসে সর্বক্ষণ. বেঁচে থাকাই দায় বলে মনে হয়. বাড়ি ফিরে এসে আজিজা ঘর পরিষ্কার করে. নামাজ পরে. বাকি রান্না করে. আবার যখন নামাজ পরার সময় হই তখন রশিদ ফিরে আসে. আজিজার নিজের হাতে বোনা আফঘানি লেস আর রেশম দিয়ে কাজ করা আসন পাতে. কুরুষের কাজ

করা টুপি মাথায় দিয়ে রশিদ ও তার পরিবার নামাজ পরে. তারপর চলে খাবারের পর্ব. বাড়িতে রেডিও একমাত্র রাশিদেরই আছে. তাই কোলবার অনেকেই রশিদের বাড়ি আসে রাডিও শুনতে. খবর শোনার পরে সকলের ভয়ে বুক কাঁপে. আমেরিকা চলে যাওয়ায় ভালো. অন্তত প্রতিনিয়ত মৃত্যুর হাতছানি তো নেই সেখানে.

রশিদ স্বপ্ন দেখে, নূর আর তারিখ আমেরিকান ইস্কুলে পড়তে যাচ্ছে. আজিজার মাথায় আর ঘোমটা নেই... বোরখাও খুলে ফেলেছে সে.. এখন যেন চোখ ফেরানো যায় না তার দিক থেকে...আসন্ন শিশুটিও ততদিনে জন্মে গেছে. রশিদ দুই ছেলের পরে এবারে একটি মেয়েই আশা করে. হঠাত যেন সে শুনতে পায় ছোট্ট একটি মেয়ে কোন সবুজ ঘাসের ঘেরা মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে এসে একগুচ্ছু সাদা ফুল হাতে নিয়ে পেছন থেকে রশিদ কে জড়িয়ে ধরে আব্বাজান বলে ডেকে ওঠে... গভীর মমতায় রশিদের দুই চোখ জল এ ভরে ওঠে... নিজেকে সম্পূর্ণ মনে হয়...সেই মুহূর্তে সুখের আতিসঙ্ক্যে রশিদের মুখে এক টুকরো হাসিও ফুটে ওঠে... স্বপ্ন যখন রঙিন, তখনি হঠাত সন্ধ্যের অন্ধকারে এক রাশ আলো জ্বলে ওঠে ঘরের মধ্যে. কারুর কিচ্ছু বোঝার আগেই গগনভেদী শব্দে আর আগুনের ফুলকিতে সব শেষ. রশিদ... নূর... তারিখ...আজিজা, নানু আর আর লায়লা পাশের কোনো একটা বাড়িতে কি একটা কাজ এ গিয়েছিল... মাইল খানেক পথ হেটে যেতে হয়েছিল...বাড়ি ফেরার পথে হঠাত দূর থেকে দেখতে পায় এক রাশ আলো... তারপর কালো ধোয়া... আর সেই সঙ্গে আর্তনাদ... গর্ভের সন্তানের কথা ভুলে আজিজা ছুটে বাড়ির দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে... নানু আগে থেকেই আঁচ করতে পারে কি ঘটে গেছে... জড়িয়ে ধরে আজিজাকে আটকানোর চেষ্টা করে... কিন্তু সে বন্ধন ছিন্ন করে সে মরিয়া হয়ে বাড়ির দিকে থমকে দাড়িয়ে পরে হঠাত. সদর দরজার সামনে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে... ততক্ষণে সব পুরে ভস্মীভূত. পোড়া ছাই, জ্বলন্ত কাঠ, কালো ধোয়া... বিবর্ণ দেওয়াল, ছেঁড়া জামার টুকরোর মধ্যে আজিয়া হাতরে বেড়ায় তার স্বামী পুত্রকে....

মৃত্য আফঘানিস্থানে তার করাল ছায়া বিস্তার করেছিল সর্বত্র. তন্দুর এ যাওয়ার পথে অনেকসময় নানু তার দু চোখের ওপরে হাথ রেখে বলেছে ওই দিকে তাকাস না তুই... তবুও আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে আজিজা দেখেছে জ্বলন্ত ধংসস্তুপ. ইদানিং রাস্তার ধারে পোড়া, পচ ধরা মানুষ ও সে দেখেছে... ছোট্ট মেয়েদের সেনাবাহিনী তাদের গাড়িতে জোর করে তুলে নিয়ে গেছে.. এমন ঘটনাও ঘটেছে তার চোখের সামনে..এই অবস্থায় এমন দৃশ্য দেখে কতদিন ভয়ে দু:স্বপ্নে চিৎকার করে উঠেছে সে ঘুমের মধ্যে... রশিদ তখন গভীর ভালবাসায় আজিজা কে জড়িয়ে ধরেছে.. ঠোটের ওপরে ঠোট রেখে দু হাথ দিয়ে জড়িয়ে ধরে তার কানের কাছে ঠোটের উষ্ণ পরশ রেখে রশিদ বলেছে.. "আল্লা মেহেরবান... আজিজা জো আমাদের আল্লা রক্ষা করবেন... আমাদের কিচ্ছু হবে না... আমীন.." আজিজা রশিদকে তার বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছে... তার মলাম শরীরের প্রতিটি ভাঁজের মধ্যে রশিদ তখন যেন খুঁজে পেয়েছে আশ্রয়... মুচকি হেসে.. রশিদের মাথা তুলে মুখের সামনে মুখ এনে আজিজা তখন বলেছে.. "তুমি তো আছ.. আমি মিছিমিছি ভয় মরি... আল্লা মেহেরবান... আমীন..."

কিন্তু একই হলো একটা সন্ধ্যের মধ্যে.. সব হারিয়ে গেল নিমেষে... অসহায়ের মত সেই ধংসের মধ্যে বসে আজিজা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল... আর ঠিক সেই সময় শুরু হলো যন্ত্রণা... ভয়ংকর যন্ত্রণা.. প্রসব যন্ত্রণা... আজিজা চিৎকার করে উঠলো... কিন্তু সেই হাহাকারের মধ্যে হারিয়ে গেল তার গলার আওয়াজ... কেউ ছুটে এলো না... কোনো সাহায্য পেল না আজিজা... নিজেই উঠে দাড়ানোর চেষ্টা করলো সে... কিন্তু পা সরল না... রক্ত গড়িয়ে পড়ল পা বেয়ে... অচেতন অজ্ঞান অবস্থয়ায় আজিজা ছুঁতে চাইল হাথ বাড়িয়ে রশিদের পোড়া দেহের পরে থাকা অংশ... কিন্তু পারল না... মাটিতে শুয়ে পরে রইলো... যে রক্তের ওপরে আজিজা বসে ছিল সেই রক্তের সঙ্গে মিশে গেল তার রক্ত... বাবার চিতাভশ্বের ওপর জন্ম নিল একটি ফুলের মত কন্যা সন্তান... আজিজা অজ্ঞান হয়ে পরে রইলো সেখানে... ভূমিষ্ঠ সন্তানদের কান্না কেউ শুনতে পেল না.. আগুনের ফুলকি তখন কোথাও কোথাও থেকে বেরোচ্ছে... কোথাও বা দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে... কিচ্ছু আসবাবপত্র তখনও জ্বলছে... আর জ্বলছে মানুষের দেহ... কান্না... আশা...স্বপ্ন... তার সঙ্গে জীবন ও...

আজিজার বিয়ের এক বছরের মধ্যেই সে সন্তান ধারণ করেছিল. মাত্র ১৪ বছর বয়সে তার বিয়ে হয়েছিল ২১ বছর বয়সী রশিদের সঙ্গে. প্রসব যন্ত্রনায় সে যখন ছট ফট করছিল, আজিজার আম্মি তখন তাকে বলেছিল, "এই হলো মেয়েদের জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা. তোর ভেতরে আল্লা আছেন এখন..." সেই কথা ভেবে কিশোরী আজিজা বালিশে মুখ গুঁজে আম্মির হাত

ধরে আসন্ন সন্তানের প্রতিক্ষা করে. এক মুহূর্তের জন্য হলেও একবার আল্লার মেহেরবানী পেয়ে নিজেকে নারী রূপে, মা রূপে আরেকবার দেখতে ইচ্ছে করেছে আজিজার. ২ দিন অসহনীয় যন্ত্রণার পরে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেয় আজিজা. সেদিন বাড়িতে দাওয়াত দিয়েছিল রশিদ. আজিজার আম্মি নিজের হাতে রান্না করেছিল. কোলবার সবাই পাত পেরে খেয়েছিল সেদিন. রশিদ সদ্যজাত সন্তানকে কোলে নিয়ে বলেছিল,"আমার চোখের মনি... মেরে নূর... " সেই থেকেই আজিজা তার প্রথম সন্তানের নাম রেখেছিল নূর. কিছুদিন আগেও একদিন বোমার শব্দে ঘরের জানলার কাঁচে যখন ফাটল ধরছে, তখন বিছানায় রশিদের পাশে শুয়ে আজিজা সুখের স্বপ্নে বিভোর. মৃত্যুর হাতছানি তো সর্বত্র, সব সময়.. কিন্তু তবুও জীবন তো আর থেমে থাকে না... তাই হয়ত নিবিড় ভালবাসার অটুট বন্ধনে আবদ্ধ এই স্বামী স্ত্রী স্বপ্ন দেখে চলে অবিরাম. স্বপ্নের মায়া জাল রচনা করে অনির্বার. উষ্ণ লেপের আদরে, রশিদের বুকের ওপরে ঠোটের আলগা স্পর্শ রেখে আজিজা বলে ওঠে, "এবারে যেন আমার মেয়েই হয়." রশিদ হেসে বলে,"কেন মেয়ে কেন?" আজিজা বলে ছেলেবেলায় পুতুল খেলতাম... আম্মি বলত বড় হলে এমনি করে তোর মেয়ের নিকাহ করাস... এমনি করেই সাজাস..." বলতে বলতে আজিজার গলা ভারী হয়ে আসে. তবুও সে বলে চলে, "আম্মি কতবার আমায় কত নতুন পুতুল কিনে দিয়েছে. জানো? আমার পুতুলের কিন্তু কখনো কোনো হিজাব ছিল না... কখনো কেউ ওদেরকে বোরখা পরাতে বলেনি... হয়ত পুতুল বলেই তাই... আব্বাজান বলত... মেয়েদের স্বাধীনতা, মেয়েদের লেখাপড়া না শেখালে... মেয়েরা শিক্ষিত না হলে কোনো সমাজ উন্নতি করতে পারেনা. তাই হয়ত আমাকেও স্কুলে ভর্তি করেছিল আম্মি... তখন আফঘানিস্তান সত্যি অন্য রকম ছিল... " আজিজা হঠাত আনমনা হয়ে যায়. বুকের মধ্যে তোলপার শুরু হয়. গলার মধ্যে কান্না কুন্ডলী পাকিয়ে স্বর চেপে ধরে. গম্ভীর সুরে আরও কি সব বলতে যাওয়ার আগেই রশিদ বলে ওঠে, "তোমার কি আবার ছোট হতে ইচ্ছে করে?"

আজিজা রশিদের গায়ের ওপর থেকে হাত সরিয়ে খাটের ওপরে উঠে বসে. একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে ওঠে," দূর! আমি কি তাই বলছি? আমার কি আর ছোট হওয়ার উপায় আছে? রশিদ গভীর ভালবাসায় আজিজাকে কাছে টেনে নিয়ে বুকের মধ্যে মুখ লুকোয়...তারপর বলে "দেখো আমাদের মেয়েই হবে.."

রশিদের সব স্বপ্ন এমন করে সত্যি হয়নি.. সেই ধ্বংসস্তুপের মধ্যে থেকে, কখন কিভাবে, কে আজিজাকে উদ্ধার করেছিল আজিজা তা টের পায় নি.. অজ্ঞান অবস্থয়ায় কেই বা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল তাও আজিজা জানে না... কোন আল্লার বান্দা তার জীবনদান করেছে সেদিন... আজিজা হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে তাকে একবার দেখতে চেয়েছিল.... কিন্তু হয়নি সে আশা পূর্ণ... যখন জ্ঞান ফিরেছে আরো ভয়ানক দৃশ্য দেখে আবার আরেকবার জীবনের যুদ্ধে পরাজয় স্বাকীর করেছে সে... মরা মেয়েটার দেহ কালো কাপড়ে মুরে হাসপাতালের আয়া আজিজার সামনে এনে বলেছে... "হামশিরা ...একবার ...." আর বলতে দেয় নি... আজিজা... কুকড়ে কেঁদে উঠে বলেছে...নিয়ে যাও... নিয়ে যাও... তারপর খাটের উপরে শুয়ে বুক ভরা বেদনা আর হাহাকার নিয়ে জীবনের এই ধূসর রঙের পোড়া দগ্ধ টুকরোগুলো একসঙ্গে করে বাঁচার চেষ্টা করে সে... একটু সুস্থ্য হওয়ার পরে একদিন নানু আর লায়লা এসে আজিজাকে নিয়ে যায় হাসপাতাল থেকে. কাবুলের এক অন্ধকার গলির মধ্যে কয়েকটি টিনের ঘরে ওরা আবার নতুন করে ঘর বাঁধে... নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার যুদ্ধ্য শুরু করে...

অচেনা কাবুলের, অজানা মানুষের ভীড়ে, সব স্বপ্নের বিসর্জনের পরে, নানু, লায়লা আর আজিজা তাদের জবন্তাকে বহন করে নিয়ে চলে কোনো ভাবে... কখনো ভিক্ষে.. কখনো দান... কখনো কিছুই না...কখনো সেই লড়াইয়ের শত্রু মানুষ... কখনো ভয়.. ভারতীয় সেনা বাহিনীর জওয়ান... বা পাকিস্তানের সেনা বাহিনীর জওয়ান... তারা এসে মাঝে মধ্যেই হানা দেয় ওই টিনের ঘরে... মাংসের লোভে... এই টিনের ঘরের মানুষের দোল রাস্তায় পরে থাকা জঞ্জালের মতই... এদের অতীত পুরে ছারখার... এদের কুল নেই.. মান নেই... লজ্জা নেই... তাই হয়ত এরা প্রতি রাত্রের সহজ শিকার... এক একজন জওয়ান আসে... যাকে পছন্দ তুলে নিয়ে যায়... ভোগ করার পরে.. রাস্তায় ফেলে রেখে চলে যায়... মুখ ফিরিয়ে তাকাও না... অপমানে... লজ্জায়... শোকে... সেই ধর্ষিতা আত্মহত্যা করে... এছাড়াও আসে তালিবান... ছোট ছোট শিশুদের মায়ের কল থেকে তুলে নিয়ে যায়... জিহাদের নামে অন্ধ করবে বলে... প্রতিবাদ করার কেউ থাকে না... কেউ এগিয়ে আসলে শহরের মাঝ

খানে... আল্লা হু আখবার বলে... তার গলা কেটে দেওয়া হয়... বা হাত কেটে ফেলা হয়... এরই মধ্যে আজিজা নানু আর লায়লা বেঁচে থাকে... তবুও...

3rd part

কলকাতায় প্রেসিডেন্সি জেলে আজিজার সঙ্গে দেখা করতে আসে এক মহিলা সাংবাদিক... কিছুদিনের মধ্যেই বিচার হবে আজিজার... আজ প্রায় ৫ বছর পরে তার স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়েছে সকালে... সেই লোকটি যে নতুন বউ এর বাড়ির দরজায় রোজ রাত্রে এসে কড়া নেড়ে যেত... আজ সে এতদিন পরে জেলের গড়াদের সামনে এসে দাঁড়ায়... আজিজা এখন নিরাপদ...সে জানে... তার জীবনের সকল বিপদের অবসান ঘটেছে.. এও জানে মৃত্য আসন্ন.. তবুও... কিসের জন্য সে জেলে তার খেলাচ্ছলএ বিয়ে করা স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে আসে কারণ সে নিজেও জানে না... গড়াদের এপাশ থেকে বলে ওঠে..."তাশাক্ষর সাহাবাবু... আপনি পুলিসে খবর দিয়েছিলেন? ভালই করেছেন... মরার আগে নিজের দেশে তো ফিরতে পারব আমি... এর জন্য তাশাক্ষর... ধন্যবাদ".

লোকটি মাঝবয়সী... কাঁচা পাকা চুল.. এক মুখ দাড়ি.. মাথায় টাক... মুখের মধ্যে অসংখ্য দাগ... ঠোটের রং কালো... এক মুখ পান চিবোতে চিবোতে সাহাবাবু বলে ওঠেন... "মাগী.. তোকে বললাম আমার সঙ্গে চল... তুই এলি না... এবারে মর..." আর বেশি কথা বলার আগেই.. সাহাবাবু কে পুলিসের পেয়াদা এসে ধরে নিয়ে চলে যায়... অন্য ঘরে... আজিজা বোঝে সে নিজে ধরা পরেছে বলেই... আজিজা কেও ধরিয়ে দিয়েছে...

ইতিমধ্যে আজিজাকে নিয়ে যাওয়া হয় অন্য ঘরে... ওই মহিলা সাংবাদিকের সামনে... জিজ্ঞাসাবাদের জন্য... ওপর মহল থেকে পারমিসন করিয়ে এই মহিলা সাংবাদিক একা ঘরে ঢোকে... আজিজার মাথায় তখন আর ঘোমটা নেই... বোরখাও নেই.. সাধারণ ভাবে একটা নিল পার সাদা শাড়ি পরে আজিজা বসে থাকে একটা চেয়ারে. মাথা নিচু করে শুধু হিল তোলা জুতোর খট খট শব্দ কানে আসে...

শুরু হয় একের পর এক প্রশ্ন... যার উত্তর আজিজা নিজে আর সেই সঙ্গে তার ভাষা... আজিজার চোখের জল... তার বুকের হাহাকার... কান্না... তার পরিচয়... তার লুকোনো সত্তা..তার হারিয়ে যাওয়া মুহূর্ত.. কাবুল.. আফ্ঘানিস্থান... ভারতবর্ষ.. কলকাতা... নতুন বউ...

সাংবাদিক টির বয়স আজিজার মতই হবে.. কিন্তু ঝক ঝকে চেহারা... বুদ্ধিদীপ্ত চোখ... কঠিন ঠোটের রেখা.. শরীরজুড়ে ত্যাজ...

আজিজার সঙ্গে চোখে চোখ পরতেই... সেই সাংবাদিক মহিলা বলে উঠলেন.. "আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে... আপনি তো ভারতীয় নন.. কিন্তু বহুদিন যাবত ভারতবর্ষে ইল্লিগালি বাস করেছেন... যতটুকু আমি জানি আপনার সম্পর্কে.. সেটা আরো বাকি সবাই জানে... আজ আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই... যা কেউ জানে না... আপনার কথা... আমায় বন্ধু ভেবে আমায় সব বলতে পারবেন তো?" আজিজা এতক্ষণ শান্ত হয়ে বসেছিল... বন্ধু শব্দে হঠাত যেন একটু থমকে গিয়ে বলল.. বন্ধু? নাহ..! বন্ধু হয়ে না... আজ এমনি সব বলব... যে কাঠিন্য সাংবাদিকটির মুখে চোখে ধরা দিয়েছিল আজিজার গলার আওয়াজে হঠাত কেমন যেন দুর্বল হয়ে গেল সব... আজিজার মুখের সামনে একটা ট্যাপ রেকর্ডার বের করে এক হাথ দিয়ে ধরে রইলো সে.. আর আজিজা বলতে শুরু করলো তার ইতিহাস... আজিজা.. থেকে নতুন বউ হওয়ার ইতিহাস.. রক্ত আর ভালোবাসাহীন... নিষ্ঠুর... জ্বলন্ত একটা ইতিহাস.. যার সাক্ষী একমাত্র সে নিজে...

সেদিন নানু কে তুলে নিয়ে যেতে চেয়েছিল ওরা... ভারতীয় সেনা বাহিনীর কিছু সেনা... সোভিয়েতরা তখন চলে গেছে আমাদের দেশ ছেড়ে তা অনেকদিন ...কিন্তু তবুও তখন ও হয়ত কিছু প্রতিশোধ বাকি ছিল.. আর তাই সারাদিন সেদিন একের পর এক বোমা ফেলে উজার করে দিয়েছে আমাদের সংসার... সেই রাত্রে নানু চাল আনতে বেরিয়েছিল. কোথায় গিয়েছিল জানি না... কিন্তু আমি আর লায়লা ওর দেরী দেখে বাড়ির মধ্যে কি করব একা একা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না...হঠাত বাইরে থেকে

আমরা নানুর গলার আওয়াজ পাই... কিসের জন্য সে খুব ভয় পেয়েছিল... চিৎকার করে আমাদের কি একটা বলার চেষ্টা করছিল আর দৌড়ে এগিয়ে আসছিল বাড়ির দিকে.... ঠিক সেই সময় ওই টিনের ঘরগুলোর সামনে একটা বোমা এসে পরে... ছোট বোমা হয়ত তাই খুব বেশি আওয়াজ হয় না... কিন্তু ধসে পরে খানিকটা বাইরের দিকের অংশ. আমি বেরিয়ে গিয়ে নানুর দিকে ছুটে যাই.... তখনি দেখি একদল বন্দুক ধারী সেনা নানুর পিছু নিয়েছে... আমি চিৎকার করে ভেতর থেকে লায়লা কে ডাকি... হাতের কাছে... একটা থান ইট পরে ছিল... আমি কিচ্ছু বোঝার আগেই সেটা ছুঁড়ে মারি ওই লোকগুলোকে তাক করে... নানু ছুটে এসে আমার পেছনে আশ্রয় নেয়... জানি না তখন কি হয়েছিল আমার... নিজের স্বামী সন্তানকে বাঁচাতে পারিনি.. মনে হয়েছিল নানু কে অন্তত যদি তার জীবনটা ফিরিয়ে দিতে পারি...কিন্তু আমার ক্ষমতা কোথায়? ... শরীরও তখন দুর্বল... তাই হয়ত পারিনি.. চোখের সামনে ওরা এগিয়ে এসে নানু কে আমার সামনে থেকে টেনে নিয়ে যায়. দুবার গুলি চালায় ওরা...আমি সেদিন আরেকবার খুব কাছ থেকে মৃত্য দেখেছিলাম আর মরার ভয়ে আমিও সেদিন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম. লায়লা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমায় জোর করে টেনে নিয়ে যায় ঘরের ভেতরে... ঘেন্নায়... ভয়ে ... আমি কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে পরে থাকি ঘরের ভেতরে... আর নানু শুধু কেঁদে উঠে বলে... আল্লা .... ইয়া... আল্লা.... আজিজা... আমায় বাঁচা...জানলা দিয়ে দেখি... ওই সেনাবাহিনী নানু কে রাস্তার মাঝখানে .... তখন তার দু পা বেয়ে রক্ত ঝরছে... মুখের ওপরে অসংখ্য ক্ষত চিন্হ... নিজের লজ্জা টুকু রক্ষা করার মত জামা নেই ওর শরীরে...আমি আর থাকতে পারি না... আমি বেরিয়ে যেতে চাই... রাস্তায়... ক্ষোভে... রাগে.. ঘেন্নায়... হঠাত কি যে হয়েছিল...নানুর শরীরটাকে নিয়ে তখনও ওরা খেলা করে চলেছে... আমি পেছন থেকে একটা ছুরি দিয়ে একজন লোকের পিঠের ওপরে বসিয়ে দি.

তখনও বাকি ৪ জন ছিল .. তারা এসে আমার ওপরে আক্রমন শুরু করে... বিচ রাস্তায়... আমি চিৎকার করতে থাকি... কিন্তু কেউ আসে না আমায় সাহায্য করতে... সব হারিয়েছিলাম আমি অনেকদিন আগেই... শুধু আজিজা বেঁচে ছিল এতদিন... কিন্তু সেই রাত্রের পর আমি আজিজা কেও হারালাম... আর সেই সঙ্গে আমার হিজাব...রশিদ সেদিন হারালো তার আজিজাকে... নূর আর তারিখ তাদের মা কে... ভাবতে অবাক লাগে ... যে তারপর ও আমি এখানে বসে তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারছি... বলতে পারছি যে তারপর জীবন থেমে থাকে নি... আমি নিজে মৃত আজিজাকে টেনে তুলে সঙ্গে করে নিয়ে কাবুলের বিচ শহরে এসে পালানোর চেষ্টা করেছি...যে শহর এতদিন আমার ছিল... সেদিন সেই শহর থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে আমি পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলাম...

একটা বাস শের-এ-বাজার থেকে পেশায়ার যাচ্ছিল পরের দিন রাত্রে... লায়লা আমাকে ততক্ষণে একটু সুস্থ্য করে তুলেছে... নানুর দেহ ওরাই টেনে নিয়ে গিয়ে সেই জ্বলন্ত বাড়ির ধ্বংসের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল...আমাকে কেন বাঁচিয়ে রেখেছিল জানি না... নানুকে আমরা সেদিনই হারিয়েছিলাম... আমি আর লায়লা সেই বাস এ উঠে বসি... বুঝেছিলাম রাতের অন্ধকারে বিনা পাসপোর্ট এ সেই বাসটি যখন শুধু মহিলা যাত্রীদেরই বর্ডার পার করাচ্ছিল তখন সেখানে কিচ্ছু রহস্য নিশ্চই ছিল.. কিন্তু বুঝেও সেদিন আর ভয় করেনি.. যা ঘটে গিয়েছিল জানতাম তার থেকে ভয়ংকর আর কিচ্ছু হতে পারে না... সেদিন আল্লাও সাহায্য করেছিলেন... টিকিট নেই... পাসপোর্ট নেই... কোনো পরিচয় নেই.. আমরা এসে পৌছলাম পেশায়ার ... বাস থেকে নামার আগেই মুজাহিদীন এর এক দল এসে আমাদের আবার আক্রমন করলো... বোরখার আড়াল থেকে যখনি দেখেছিলাম ওরা আসছে... বাস এ উঠছে.. আমি আল্লার নাম নিয়ে বোরখার ভেতর থেকে বাড়ি থেকে আনা সেই ছুরিটা দিয়ে ... না: ... নিজেকে মারি নি... ওদের প্রত্যককে কুপিয়ে মেরে ফেলি... কিকরে পেরেছিলাম জানি না... তখন সব এ সকাল হয়েছে... এই নতুন শহরের বুকের ওপরে সূর্য টাকেও অচেনা লাগছিল... আর সেই আলোয় নিজেকেও অজানা মনে হলো... ওরা ৩ জন ছিল... ওই মুজাহিদীনের দল.. আর আমি একা... ভেবেছিল নিরীহ স্ত্রী তাই কোনো বন্দুক সঙ্গে করে আনে নি ওরা... নাহলে হয়ত সেদিন ই গুলির আঘাতে শেষ হয়ে যেতাম আমি... আমরা.

মহিলা সাংবাদিকটি হঠাত ট্যাপ টা বন্ধ করে দেয়... আজিজও চুপ করে যায় হঠাত... সাংবাদিক মহিলাটি কোনো কথা বলে না প্রথমে... ঘরের মধ্যে বদ্ধ হাওয়াতেও যেন হঠাত একটা পোড়া গন্ধ ভেসে আসে.. সেই নিস্থব্ধতা ভেদ করে আজিজা বলে ওঠে... "অবাক লাগছে না? সত্যি বলছি কিনা সেটাই বার বার মনে হচ্ছে তাই না"?

সাংবাদিক মহিলা একটু হেসে বলে ওঠেন... আমার নাম টাই তো বলা হয়নি আপনাকে... আমার নাম তিস্তা...

বাহ.. খুব সুন্দর নাম ...!!

তারপর আবার আজিজা মুখ নামিয়ে কি যেন একটা ভাবতে শুরু করে... তিস্তা এবারে নিজের বসার চেয়ারটা একটু এগিয়ে এনে আজিজার আর একটু কাছে এসে বসে... একটা হাত বাড়িয়ে আজিজাকে একটু স্পর্শ করতে ইচ্ছে করে তার... কেন সেও নিজেও জানে না... !

আজিজা এবারে বলে ওঠে... "আমি কবে আফ্ঘানিস্থান ফিরতে পারব তুমি জানো"? তিস্তা তখন ট্যাপ অন করেনি... মাথা নেড়ে বলে না... "আমার জানা নেই"... কৌতুহল দানা বেঁধেছে... কিন্তু শোনার মনটা ভেঙ্গে চুরে চুরমার হয়ে গেছে... পৃথিবীর এই প্রান্তে বসে আর একটা প্রান্তের একজন মেয়ের জীবনের সত্যিটা যে এত নিষ্ঠুর হতে পারে তিস্তা সেটা ভাবতেও পারে না... কল্পনাও করে না... অজানা দেশের অজানা মেয়ের ভাগ্যে তার সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে... চোখ জ্বালা করে... কান্না টা বুকের মধ্যে আটকা থাকে কোন বেক্তিত্তর আড়ালে তিস্তা সেটা নিজেও বোঝে না... জানতে ইচ্ছে করে তারপর কি ঘটেছিল আজিজার জীবনে... পেশায়ার থেকে তারপর সে ভারতবর্ষে এলো কি ভাবে? কি ভাবেই বা নতুন বউ এর ঘোমটার আড়ালে নিজের হিজাব কে হারালো আর একবার... ??

"সেই বাস থেকে নেমে আমরা কয়েকজন ... ঠিক মনে নেই কতজন ছিলাম ... সবাই মিলে পালানোর চেষ্টা করি.. কোথায় যাব.. কি করব কিচ্ছুই জানি না তখন... শুধু পাহাড়ের কোল ঘেঁষে আমরা হাটতে থাকি... পা ধরে আসে... তেষ্টায় গলা শুকিয়ে আসে... তবুও আমাদের বেঁচে থাকার কি তাগিদ... তবুও বাঁচব... কিসের জন্য জানি না... কেন তাও জানি না... তবুও... আমরা পালালাম.. কিন্তু বেশি দূর যেতে পারলাম না.. বাস টা সেদিন আমাদের ভারত পাকিস্থান বর্ডার এ ছেড়ে দিয়েছিল.. সেটা আমরা জানতাম না.. আমরা জানতাম পেশায়ার যাচ্ছি আমরা.. বুঝতেও পারিনি... যে ভারতবর্ষএর এত কাছে পৌছে গেছিলাম আমরা.. যারা আমাদের পথ আটকালো তারা নিজেদের কাশ্মিরি জিহাদী বলে পরিচয় দেয়... তখন জানতাম না আমরা ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছি... কি আমাদের ভবিষ্যত ...তখন প্রায় দিনের শেষ, বিকেলের আকাশের ওপরে ফেলে আশা লাল আভা দেখে বুকের মধ্যে ভয় কুন্ডলী পাকিয়ে উঠছে... লাল দেখলেই রক্তের কথা মনে আসে.. আল্লার নিজের হাতে সাজানো... সেই বরফে ঢাকা পাহাড়ের চুড়ো দেখে তখন রোমাঞ্চ জাগছে না মনে... মনে হচ্ছে ... আরো কতখানি দেখা বাকি আছে... সহ্য করার আছে... জিহাদির দল আমাদের আবার বন্দী করে নিয়ে গেল ওদের গ্রামে... বরফে ঢাকা পাহাড়ের মাঝখানে ঝর্ণার পাশে ছোট একটা টিলার ওপরে একটা ঘরে আমাদের রাখল... বুঝলাম... এরা জানে আমরা কারা.. কোথায় কেন কিসের জন্য পালিয়ে মরছি... তখন বুঝিনি যে আমরা একটা বড় দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি যারা এই নিরীহ মেয়েদের নিয়ে কেনা বেচার ব্যবসা করে... মাংসের আদান প্রদান... !! এরা আল্লার নামে... যে পাপ করে তার কোনো ক্ষমা নেই... ক্ষমা নেই..." বলতে বলতে আজিজা এবারে কেঁদে ওঠে ... হয়ত এবারে বাঁধ ভেঙ্গে আসে... হয়ত এবারে সে আর বলতে পারবে না ... বাকিটুকু... তিস্তা ভয় পায়... এই জীবন্ত অথচ মৃত মহিলার জন্য তিস্তার বুক ভিজে যায় অচেনা চোখের জল এ... আজিজা বলে চলে...আবার.. "সেদিন রাত্রে একজন এসে আমাদের নতুন হিজাব দিয়ে গেল... আমাদের স্নান করতে বলল... সুরমা লাগাতে বলল... সেই দিন রাত্রে অনেকদিন পরে আয়না দেখলাম আমরা... আবার নতুন করে নিজেকে দেখলাম আর একবার... বাস এর মধ্যে যে লোক গুলোকে আমি মেরেছিলাম এরা তাদেরই দলভুক্ত সেটা বুঝতেও বাকি রইলো না... রাত্রের অন্ধকারে আরও কিচ্ছু কাশ্মিরি মেয়ের সঙ্গে আমাদের বলি দেওয়া হবে...তাই এই সাজ... এই হিজাব... কিন্তু হিজাব কেন? নিজেকে ঢেকে রাখার আর তো কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের?

রাত যখন অনেক ... হঠাত দরজা খোলে একজন কাশ্মিরি মহিলা... যারা ঘুমিয়ে পরেছিল তাদের কে সে আর জাগায় না.. আমি আর আরেকজন জেগে বসে ছিলাম ... আমাদের হাত ধরে বাইরে টেনে নিয়ে আসে.. তারপর মুখের হিজাব টেনে ফেলে মুখের ওপরে... কালো অন্ধকারে আমরা মিশে যাই... আমরা তিন জন... পাহাড়ি ঝর্ণার শব্দ কানে আসে শুধু... আর সেই সঙ্গে কানে আসে একটা বেচা কেনার আলোচনা... 'এরা সবাই আরব দেশে যাবে... তার মধ্যে সব থেকে ভালো দুটোকে তোমার হাতে তুলে দিলাম... যাও.. তোমার এবারে ...' বাকিটুকু শোনার আগেই একটা ট্রাক এর শব্দ... তারপর আরও অন্ধকার... এত

কালো যে বোরখার ভেতর থেকে নিজের হাত টুকু পর্যন্ত দেখতে পেলাম না আমি...
এসে পৌছলাম... কলকাতা... সেই দিনই সাহাবাবু আরেকটি মেয়েকে বাংলাদেশের একজনের কাছে বিক্রি করলেন চড়া দামে..
কিন্তু আমাকে করলেন না... কেন ?? হয়ত নতুন বউ হওয়াটা তখনও বাকি ছিল আমার ভাগ্যে..
ভাষা শিখতে আমার কোনদিন বেশি সময় লাগত না.. ছোটবেলায় আব্বাজানের সঙ্গে আমরা ভারতের হিন্দী ছবি দেখতে যেতাম... বাড়ি ফিরে এসে গর গড়িয়ে সেই ছবির ডায়লগ মুখস্থ্য বলতাম... আমরা ফার্সি মেশানো উর্দু বলতাম.. হিন্দির থেকে আলাদা... কিন্তু তবুও আমার শিখতে অসুবিধা হত না.. পড়াশুনায় আমি খুব ভালো ছিলাম... কিন্তু ১৪ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যায়.. তাই আর পড়াশুনা শেষ করে হয় না.. তাই বাংলা টাও আমি রপ্ত করি খুব তারা তারি...
কেন জানি না আমার প্রতি নজর টা ছিল একটু অন্য রকম সাহাবাবুর... তাই তিনি আমায় নিয়ে তোলেন বউ বাজারে একটা বাড়িতে... কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই পুলিস এসে হামলা শুরু করে... হয়ত খবর ছিল ওদের কাছেও...তখনি সাহাবাবু আমায় নিয়ে বউ বাজার থেকে পালিয়ে আমায় রূপ নারায়নের পাড়ে ওনার এক দূর সম্পর্কের পিসিমার বাড়িতে রেখে আসেন...কলকাতায় আমি প্রায় ২ বছর সাহাবাবুর বউ সেজে লুকিয়ে থেকেছি... আমি তখন আমার হিজাব ছেড়ে শাড়ি পরেছি... মাথায় সিন্দুর ও লাগিয়েছি... একটু একটু বাংলায় কথাও বলছি.. বাজারে বেরোলে সবাই আমায় সাহাবাবুর বউএর পরিচয়ে চিনছে... তবুও বেঁচে থেকেছি... আজ মনে হয় কেন করেছি... আব্বাজান বলত... যারা আত্মহত্যা করে আল্লা তাদের ক্ষমা করেন না... কখনো... না... তাই সেই ক্ষমা না পাওয়ার ভয়ে আমি নিজেকে শেষ করতে পারিনি... আমি বেঁচে থেকেছি.. কোন ভালোর অপেক্ষায় জানি না... আমি বেঁচে থেকেছি... আজিজা কে ভুলে গিয়ে... আমার রশিদ কে, আমার নূরকে, তারিখকে ভুলে গিয়ে...
সাহাবাবুর ভোগ করা একটা মাংসের দলা হয়ে... যার দেহ আছে... সৌন্দর্য্য আছে.. সবুজ এই চোখের গভীরে মাদকতা আছে... কিন্তু কোনো প্রাণ নেই.. "
ঘরের মধ্যে এখন আর কোনো শব্দ নেই... ডিজিটাল ট্যাপ রেকর্ডার তখনও চলেছে... সেই নিস্তব্ধতাকেও রেকর্ড করছে ওটা... তিস্তা এবারে উঠে দাড়ায়... সময়ের হিসেব সে জানে না... পরের দিন কাগজ এ আজিজার গল্প লেখার সময় তিস্তার কলম ভাষা খুঁজে পায় না... অর্ধেক লেখা... কাগজের সাদা পাতা জুড়ে যেন ঘুরে ঘুরে মরে বেঁচে থাকার কান্না... আর নি:শ্বাস বন্ধ করা একটা অনুভূতি... আজিজা আফঘানিস্থান এ ফেরার আগেই... জেল এর মধ্যেই হার্ট ফেল করে মারা যায়... কলকাতার একটা কবরখানায় তার দেহ রেখে দেওয়া হয়... কালো হিজাবে ঢেকে.. সে এখন শান্তিতে বেঁচে আছে... হয়ত রশিদ ও আছে তার সঙ্গে... আফগানিস্থান এ তার মৃতদেহ চাইবার মত কেউ নেই... হাজার হাজার আজিজা যে দেশে... সেই দেশ কি করে খবর রাখবে তার একটি আজিজা কেমন করে তার জীবনকে ভালবেসেছিল?
শেষ